প্রকৃত যাত্রা :
প্রেমের পথে
অগ্রগতি

প্রিয় বন্ধুগণ,

সকল আধ্যাত্মিক অভ্যাসীরই একটি সাধারণ লক্ষ্য থাকে, তা হলো আত্ম-পরিবর্তন । অনেক আধ্যাত্মিক যাত্রাপথে গুরুর উপর নির্ভরতার বিষয়ে জোর দেওয়া হয়েছে, যদিও অন্য কারোর উপরে নির্ভরশীল হলে নিজের মধ্যে পরিবর্তন আনা অসম্ভব। এই পরিবর্তন তখনই আনা সম্ভব যখন আমরা নিজেরা দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারব, “আমাকে করতেই হবে”। এমনকি ঈশ্বরের উপরে নির্ভর করাও নিজের দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ারই নামান্তর।

আমি যদি আমার গুরু বা অন্য কাউকে আমার বিবর্তন বা পরিবর্তনের জন্য দায়ী করি, আমার মধ্যে পরিবর্তন আসবে না। কারণটি সহজ: ঈশ্বর এবং গুরু যা প্রয়োজন তা করে দিয়েছেন। এবার অভ্যাসী হিসেবে আমার কাজ হলো, আমার হৃদয়ে বীজরূপে যা প্রদত্ত হয়েছে সে বিষয়ে ধারণা করা ও সেইসব বীজকে চেনা এবং তাদের অঙ্কুরোদগম ও বৃদ্ধিতে অনুমতি দেওয়া। অদৃষ্টের উপরে নির্ভর করা আরও নিষ্ফল - যদিও এটা সত্যি যে, কর্মের মাধ্যমে আমরা আমাদের ভাগ্য নিজেরাই তৈরি করি।

নিজেদের মধ্যে পরিবর্তন আনার আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা থাকলে আমরা দেখি যে আধ্যাত্মিকতা (বিশেষত ভারতীয় প্রথা অনুযায়ী) বলতে বোঝায় কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ। হার্টফুলনেস পথ প্রকৃতই এই তিনের সুন্দর সমন্বয়। তা সত্ত্বেও এই পথে যখন যাত্রা করি, যাত্রাপথে অনেক বিপদ আমাদের চোখে পড়ে, কারণ আমরা কর্ম আর জ্ঞানযোগের উপর খুব বেশি গুরুত্ব দিয়ে ফেলি। অধিক গুরুত্ব দিলে এগুলি এই পথের সূক্ষ্মতার পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়।

তোমরা ব্রাহ্মণদের তাঁদের আধ্যাত্মিক উচ্চতা থেকে পতিত হয়ে ব্রহ্মদৈত্যে পরিণত হওয়ার কথা; আর যোগীদের অতীব উচ্চাসন থেকে অবনমনের ফলে যোগভ্রষ্ট হওয়ার কথা শুনে থাকবে। তাদের যোগের যাত্রা অসম্পূর্ণ থেকে যেতে পারে অসংখ্য কারণের জন্য। জ্ঞানী বা কর্মযোগীর পতন ঘটতে পারে, কিন্তু কখনো কি শুনেছো একজন ভক্ত সাধকের পতনের কথা? ভক্তিভ্রষ্ট কথাটির অস্তিত্বই নেই কারণ ভক্তের খেয়াল রাখেন স্বয়ং প্রভু। যে শরণাগতি অর্জন করেছে, অর্থাৎ যে অপার শ্রদ্ধায় নিজেকে সমর্পণ করেছে, প্রভু তাকে রক্ষা করেন। সমস্যা তখনই শুরু হয় যখন

প্রভু তাকে রক্ষা করেন, যে শরণাগতি অর্জন করেছে, অর্থাৎ অপার শ্রদ্ধায় যে নিজেকে সমর্পণ করেছে। সমস্যা তখনই শুরু হয় যখন আমরা কর্তা হয়ে যাই। কোন ভক্তের কখনও আধ্যাত্মিক পতনের অভিজ্ঞতা হয় না; সাধারণত এটা কখনোই হয় না।

আমরা কর্তা হয়ে যাই। কোন ভক্তের কখনো আধ্যাত্মিক পতনের অভিজ্ঞতা হয় না। যদি সেটা কখনো হয়ও, তা কেবল প্রকৃত ভক্তির বা শরণাগতি অভাবে হয়।

আমি প্রথম যখন সহজমার্গের সাথে পরিচিত হলাম, আমার প্রশিক্ষক ভগিনী দ্রৌপদী আমাকে একটি মৌলিক প্রশ্ন করলেন, “আপনি কেন ধ্যান করতে চান?” আমি উত্তরে বললাম, “আমি ঈশ্বরকে খুঁজছি।” আজ যখন আমার কিছু ব্যক্তিগত বিশ্বাসকে ফিরে দেখি, আমি বিষয়গুলিকে ভিন্নভাবে বুঝি এবং উপলব্ধি করি যে তখন আমার ধারনা কত ভুল ছিল।যখন আমাদের মধ্যে অধিকাংশই বলে যে তারা ঈশ্বরের সন্ধান করবে, আমার

আমরা তাঁর থেকে আলাদা হলাম কখন যে তাঁকে এখন খোঁজার দরকার পড়ছে? হারিয়ে যাওয়া যোগসূত্র পুনঃস্থাপিত করতে হলে আমাদের সেই সমস্ত বিষয় চেনা এবং দূর করা দরকার যা এই বিচ্ছেদের জন্য দায়ী। প্রকৃত যাত্রার এটাই হলো শুরু।

কাছে তা বেশ হাস্যকর শোনায়। ক্ষুদ্র বস্তুকে হয়তো চোখে দেখা যায় না, কিন্তু যার অস্তিত্ব সর্বব্যাপী তা কিভাবে আমাদের চোখ এড়িয়ে যেতে পারে? একইসঙ্গে, যা সর্বস্থলে বিদ্যমান তা আমরা দেখতে পাই না, ঠিক যেমন সারা জীবন সমুদ্রে অতিবাহিত করেও মাছের ধারণা নেই যে সমুদ্র কত সুবিশাল। অন্যভাবে বলতে গেলে, আমরা ঈশ্বরকে মাত্রিকভাবে অসীম মনে করি এবং হতবাক হয়ে যাই, কারণ কখনো দেখিনি বা ধারণাও করতে পারবোনা অস্তিত্বের দূরতম প্রান্তে কি আছে। দৈবত্ব ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বা অসীম স্তরে অদৃশ্যতাকে আরও বেশি স্বীকার করে।

এমনকি আমি যদি তাকে খুঁজতে শুরু করি, আমার সীমিত ধারণা নিয়ে কিভাবে অসীমকে বুঝব, যদি না তার দিক থেকে কিছুটা হলেও সে সচেষ্ট থাকে? অসীমকে ধরা যায় না — কিভাবে তার পরিমাপ করবো যা ক্ষুদ্রতম অপেক্ষাও ক্ষুদ্র আবার বৃহত্তম অপেক্ষাও বৃহৎ? তাছাড়া আরেকটি সমস্যাও আছে, কারণ স্থূল কখনও সূক্ষ্মের অস্তিত্ব সম্পর্কে অবগত হয় না।

সুতরাং ভক্তি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে শরণাগতির পথ অনুসরণই একমাত্র উপায়।

> वो दिल कहां से लाऊं, जो तुझे पहचाने!
>
> কোথা হতে সে হৃদয় আনি
> যে শুধু প্রভু তোমাকেই চেনে

এই সমস্ত কিছুর বাইরে, আমাদের একটা মৌলিক ধাঁধার সমাধান করতে হবে - প্রথমত, আমরা তাঁর থেকে আলাদা হলাম কখন যে তাঁকে এখন খোঁজার দরকার পড়ছে? হারিয়ে যাওয়া যোগসূত্র পুনঃস্থাপিত করতে হলে আমাদের সেই সমস্ত বিষয় চেনা এবং দূর করা দরকার যা এই বিচ্ছেদের জন্য দায়ী। প্রকৃত যাত্রার এটাই হলো শুরু।

কল্পনা কর তুমি সমুদ্রতটে ঢেউয়ের নৃত্য উপভোগ করছ। কিন্তু তুমি গভীর সমুদ্রের জল দেখতে পাচ্ছ না, কারণ তুমি কেবল পৃষ্ঠের তরঙ্গগুলি দেখতে পাচ্ছ। তরঙ্গগুলিও যেন জিজ্ঞাসা করে চলেছে, "সমুদ্র কোথায়?" তারাও তাদের সন্ধানে অস্থির। যে মুহূর্তে তারা ধীর হয়ে যায় ও স্তিমিত হয়, তল ও তরঙ্গগুলি সমুদ্রের সঙ্গে একীভূত হয়ে স্পষ্টতার রূপ নেয়।

তরঙ্গগুলি ভুলে যায় যে তাদের উৎস হল সমুদ্র - সেগুলি সেখান থেকে উৎপন্ন হয়ে আবার সেখানেই মিশে যায়। তরঙ্গ এবং সমুদ্র এক হয়ে যাওয়ার জন্য মূল শর্তটি হ'ল ধীর হওয়া, থামা এবং স্থির হওয়া। চূড়ান্ত বিরতি হ'ল মৃত্যু। সুতরাং, আমরা যদি অন্তত মৃত্যুর বৈশিষ্ট্যগুলিও অনুকরণ ও অনুমান করতে পারি, এবং জীবন্মৃত হয়ে উঠি তবে অনুকূল স্বীকৃতি আমাদের হৃদয়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে জন্ম নেবে। এখন, আসল মহাসাগরের সঙ্গে এক হওয়ার শুভ মুহূর্তটি শুরু হবে, এটি একটি সমাধির স্থিতি যা মূল সমাধির অনুরূপ। শারীরিক মৃত্যু সমস্যার সমাধান করে না। প্রকৃতপক্ষে, সমস্যাটি আমাদের সূক্ষ্ম অস্তিত্বগুলিকে নিয়ে আবৃত থাকে এবং জন্ম ও মৃত্যুর চক্রটি অনাদিকাল পর্যন্ত অবিরত থাকে।

নিজেকে বশীভূত করে আরাধ্যের প্রতি প্রেমের প্রকাশই হল ভক্তি। এটি সুনির্দিষ্টভাবে হয় যখন আমরা নিজেকে অতিক্রম করি এবং তখনই সমাধানটি পাওয়া যায়।

> जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही।
> सब अँधियारा मिट गया, दीपक देखा माही।।
>
> হরি ছিল না, যবে ছিলাম 'আমি',
> এখন হরি আছে, তাই নেই 'আমি'।
> সকল আঁধার দূর হল,
> যবে আমাতে দেখেছি আলো।

আমরা যদি অন্তত মৃত্যুর বৈশিষ্ট্যগুলিও অনুকরণ ও অনুমান করতে পারি, এবং জীবন্মৃত হয়ে উঠি তবে অনুকূল স্বীকৃতি আমাদের হৃদয়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে জন্ম নেবে। এখন, আসল মহাসাগরের সঙ্গে এক হওয়ার শুভ মুহূর্তটি শুরু হবে, এটি একটি সমাধির স্থিতি যা মূল সমাধির অনুরূপ।

আমিত্ববোধের অন্ধকারই হল মায়া যা আমাদের প্রভুর প্রতি দৃষ্টিকে প্রতিরোধ করে। তিনি যখন হৃদয়ে উপস্থিত থাকেন তখন কেবল আলো থাকে এবং আমাদের ভিতরের বা আমিত্বের অন্ধকার মুছে যায়।

সচেতনতার চূড়ান্ত সীমা হ'ল সম্পূর্ণ দিব্যতা বোধ। সচেতনতার উচ্চতা এবং গভীরতা চেতনার মহাসাগরে এমনিই খুঁজে পাওয়া যায়। যখন আমরা এটি বুঝতে পারি, তখন আমরা পূজ্য বাবুজীর তীক্ষ্ণ ও গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন প্রশ্নের অর্থ বুঝতে পারি: "এই চেতনাটি কী ধারণ করে?" কেবলমাত্র যখনই আমরা ভালবাসা এবং মহত্ত্বকে অস্বীকার করি তখনই আমরা আমাদের নিজস্ব সত্তার উচ্চতা এবং গভীরতার দৃষ্টি হারাতে থাকি এবং যা আমাদেরকে একটি সংকীর্ণ সচেতনতার দিকে নিয়ে যায়।

প্রিয়জনের প্রতি নিবিড় ভালবাসা, আবেগের ক্রমবর্ধমান ও পতিত তরঙ্গকে বিস্মৃত করে এক হয়ে ওঠার এবং এক হয়ে যাওয়ার এক অভিন্ন ঐশ্বরিকতা হল ভক্তি। বিপরীতে, এটি প্রিয়তমের সচেতনতা থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায় যা ব্যথা এবং দুর্দশা নিয়ে আসে।

যে ব্যক্তি তার অন্তঃস্থিত কম্পাস হারিয়ে ফেলেছে বা যার অন্তঃস্থিত কম্পাসটি সেইদিকের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আছে যা দেবতার বিপরীতে রয়েছে তার চেয়ে বেশি কেউ গরিব (তুচ্ছ, আরও খারাপ) হতে পারে না। প্রিয়জনের প্রতি নিবিড় ভালবাসা, আবেগের ক্রমবর্ধমান ও পতিত তরঙ্গকে বিস্মৃত করে এক হয়ে ওঠার এবং এক হয়ে যাওয়ার এক অভিন্ন ঐশ্বরিকতা হল ভক্তি। বিপরীতে, এটি প্রিয়তমের সচেতনতা থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায় যা ব্যথা এবং দুর্দশা নিয়ে আসে।

ইহুদি ঐতিহ্য অনুসারে 'পাপ'-এর সংজ্ঞা খুব পরিষ্কার করে বলা হয়েছে - যা কিছু উপাস্য, তার থেকে দূরে সরে যাওয়াই হলো পাপ। বাবুজি বলেছেন অকৃতজ্ঞতা হল পাপ। যখনই আমরা অকৃতজ্ঞ হই, তখনই

প্রকৃত সম্পর্ক থেকে বিচ্যুতি, শাখা-প্রশাখা মেলতে শুরু করে। অকৃতজ্ঞতা থেকে বিভ্রান্তির শুরু; সুতরাং তা পাপ। প্রেম তখন অস্তিত্বহীন, আর তাই সম্পর্কও শেষ। সম্পর্ক শেষ করে কোথায় যাবে? ধরো, কোনও ঢেউকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, "ওহে প্রকান্ড ঢেউ, তুমি এই মহাসাগর ছেড়ে দূরে কোথায় যাবে?"

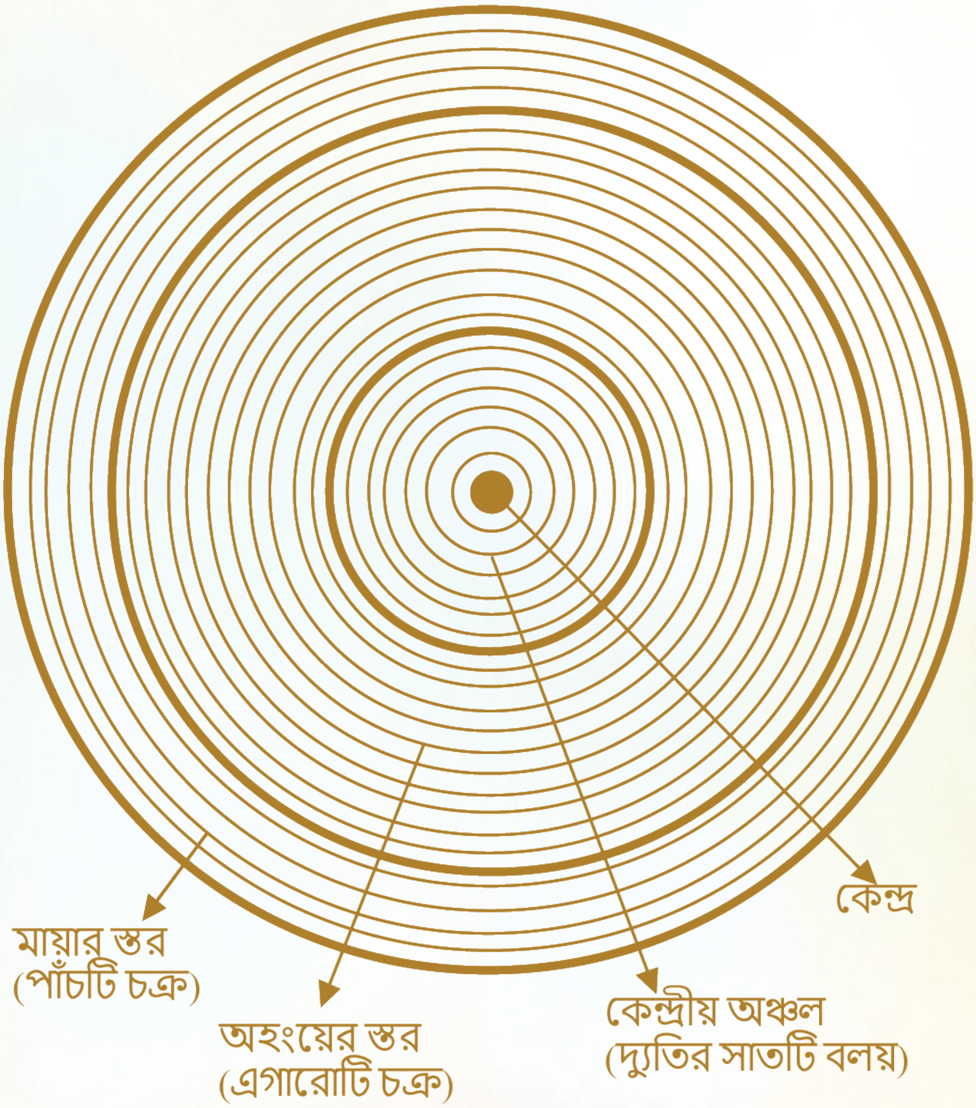

মুক্তির যাত্রা পথ

এই পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, যে কোনও বিচ্যুতি, যা আমাদের সচেতনতাকে পার্থিব সম্পদ, দেহ, মন, বুদ্ধি এবং অহংকারের সঙ্গে এক করে দেখায়, তা কেন্দ্র থেকে, জীবনের উৎস থেকে, অর্থাৎ আত্মার কাছ থেকে দূরে নিয়ে যায়। বাবুজি যেভাবে সহজ করে সাংখ্য-তত্ত্বের ধরনে ছবিতে তেইশটি চক্রের মাধ্যমে মায়া এবং অহং-এর উপস্থাপনা করেছেন, তা খুবই সুন্দর । এই রেখাচিত্রে মায়ার কেবল ৫টি চক্র, যেখানে অহংকারের ১১টি চক্র। এর একমাত্র অর্থ হ'ল, অহং অর্থাৎ অহঙ্কারই আমাদেরকে কেন্দ্র থেকে দূরে পরিধির দিকে চালিত করছে। অহঙ্কার মায়ার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী পথভ্রষ্টকারী। এটি এক ধরণের বিভ্রম।

মহর্ষি পতঞ্জলি একে বলেছেন ভ্রান্তিদর্শন অর্থাৎ ভুল ধারণা। আমি পার্থিব সম্পদ সংগ্রহের বিরুদ্ধে নই, কিন্তু বাহ্যিক সমৃদ্ধি ও সম্পদসংগ্রহকে আমাদের অন্তরের দরিদ্রতার প্রতিফলন বলেই চিহ্নিত করি। এইধরনের সম্পদ শুধুমাত্র ভ্রান্তি অর্থাৎ মায়া বা নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টি করে। অভ্যাসজনিত মায়ার উপর ভর করেই জীবন বয়ে চলে। আমাদের মধ্যে যারা শ্রেষ্ঠ তাঁরাও এই সত্যটা উপলব্ধি করতে পারেন না।

এইসব মায়া, অজ্ঞতার অন্ধকার ও অজ্ঞানের অস্পষ্টতার মধ্যে জীবনযাপন করা নরকবাসের মতো। অথচ স্বচ্ছ সরল ও আনন্দময় জীবনযাপনই

এইসব মায়া, অজ্ঞতার অন্ধকার ও অজ্ঞানের অস্পষ্টতার মধ্যে জীবনযাপন করা নরকবাসের মতো। অথচ স্বচ্ছ সরল ও আনন্দময় জীবনযাপনই স্বর্গীয় বা দিব্য জীবন। ভক্তি এবং তার সঙ্গে যা নিয়ে আসে এটা তারই মাহাত্ম্য।

স্বর্গীয় বা দিব্য জীবন। ভক্তি এবং তার সঙ্গে যা নিয়ে আসে এটা তারই মাহাত্ম্য। যখন আমরা এই অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবনযাপনে বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠি তখন চরম হতাশায় আমরা ঘোষণা করি, 'এখন থেকে এমন একটা জীবনশৈলী গ্রহণ করবো যা আমাকে অন্তর্মুখী হতে সাহায্য করবে।'

এটাই সমুদ্রের উপরিভাগের তরঙ্গভঙ্গের শান্ত হওয়া শুরু। আমাদের সবরকম চাহিদা পূরণের জন্য দৈনন্দিন কার্যকলাপ থেকে উদ্ভূত দ্বন্দ্ব একধরণের তপস্যা বা সাধনা হয়ে উঠতে পারে। এটা যদি তপস্যায় পরিনত হয়, তবে নিশ্চিতভাবে আমাদের কর্তব্য পালন আমাদের প্রিয় প্রভুর জন্য ভালোবাসার সঙ্গে কর্তব্য সম্পাদন হয়ে ওঠে। এই কক্ষপথের পরিসমাপ্তি হয় বিশুদ্ধ ভক্তিতে।

ভক্তির অর্থ এটাও হয় যে জ্ঞানের আলোকে জীবনের সবধরণের বিরুদ্ধতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত হয়ে তাকে মেনে নিয়ে জীবনযাপন করাও। ধ্যান মানে কেবলমাত্র একটা মানসিক ক্রিয়াই নয় বরং দেহ মনের অতীত কিছু।অনেকেই অভিযোগ করেন যে বিভিন্ন বিক্ষিপ্ততায় ধ্যান লক্ষ্যচ্যুত হয়ে পড়ে। কিন্তু ভক্তির সঙ্গে ধ্যান করলে আরও নিখুঁতভাবে সেই অদৃশ্যকে গ্রহণ করতে সক্ষম হয়; কারণ তাদের মন সবরকম জ্ঞানসঞ্জাত বা আবেগতাড়িত আসক্তি থেকে মুক্ত থাকে।

ভক্তির অর্থ এটাও হয় যে জ্ঞানের আলোকে জীবনের সবধরণের বিরুদ্ধতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত হয়ে তাকে মেনে নিয়ে জীবনযাপন করা। ধ্যান মানে কেবলমাত্র একটা মানসিক ক্রিয়াই নয় বরং দেহ মনের অতীত কিছু।অনেকেই অভিযোগ করেন যে বিভিন্ন বিক্ষিপ্ততায় ধ্যান লক্ষ্যচ্যুত হয়ে পড়ে। কিন্তু ভক্তির সঙ্গে ধ্যান করলে আরও নিখুঁতভাবে সেই অদৃশ্যকে গ্রহণ করতে সক্ষম হয়; কারণ তাদের মন সবরকম জ্ঞানসঞ্জাত বা আবেগতাড়িত আসক্তি থেকে মুক্ত থাকে। বিভিন্নধরণের মানসিক বিচ্যুতির ফল হলো চিত্তবিক্ষেপ। এই মানসিক বিচ্যুতির জন্য দায়ী আমাদের মনের গঠন যাকে আমরা বলি সংস্কার।

আমাদের সংস্কারগুলি ধীরে ধীরে দূর করে মনকে বশে আনা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সময়সাপেক্ষ হয়ে থাকে। অন্তরের অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নিতে আমাদের দীর্ঘ সময় লাগে।কারণ সংস্কারগুলি ভিতরের জায়গা সহজে

ছাড়তে চায় না। তখনই আমরা উপলব্ধি করি যে শুধু যন্ত্রনা নয় আনন্দ সহ্য করার ক্ষেত্রেও আমাদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

একজন অভ্যাসীর ক্ষেত্রে এবং প্রশিক্ষকের ক্ষেত্রেও আনন্দপূর্ণ বা বিষন্ন অবস্থায় উপনীত হওয়া সহজাতভাবেই এইসব জটিলতাকে ছিন্ন করেই হয়। যতক্ষন আমাদের ইচ্ছাপূরণ হয় আমাদের গভীর বিশ্বাস জন্মাতে থাকে। যে মুহূর্তে আমাদের কোন ইচ্ছা দীর্ঘ সময় বিলম্বিত হয়, আমাদের হয় সংস্থার উপর নয় অভ্যাসের উপর নাহলে গুরুর উপর অবিশ্বাস জন্মাতে থাকে। যেমন একজন অভ্যাসী লিখেছেন, ‘দাজী , আমার অবস্থা এখন খুব ভালো। আপনার আশীর্বাদে আমার মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। আমি এখন সম্পূর্ণ মুক্ত। আমার এখন আর কোনো দুঃখ নেই, আমি ঠিক করেছি সারাজীবন আপনার সেবা করে যাব।’ কয়েক সপ্তাহ পরে সেই একই লোক অভিযোগ করলেন, এমনকি আমায় পক্ষপাতদুষ্ট বললেন। আমি যখন তার এরকম বহিঃপ্রকাশের কারণ জানতে চাইলাম উনি স্পষ্ট বলে দিলেন, ‘আপনি আমার স্ত্রীকে তার অসুস্থতার সময় সাহায্য করেননি। এখন আমার স্ত্রী মারা গেছেন। আমি সমস্ত হৃদয় দিয়ে আপনার কাছে প্রার্থনা করেছিলাম, দেখুন তার ফল কি হলো! এখন আমার বিশ্বাস চলে গেছে এবং আমি আর ধ্যান করতে পারছি না। আমার মনে হয় বাবুজী যদি থাকতেন তিনি অবশ্যই আমার স্ত্রীকে ভালো করে দিতেন। ‘

রোজ রোজ এইরকম অভিজ্ঞতা লাভ করে আমরা নারদ ভক্তিসূত্রের ৫৪ নাম্বার সূত্রের সত্যতা উপলব্ধি করি।

> गुण-रहितं कामना-रहितं प्रतिक्षण-वर्धमानं,
> अविच्छिन्नं सूक्ष्मतरं अनुभव-रूपम्।
> (नारदभक्तिसूत्राणि ५४)

যার হৃদয়ে ভক্তি আছে প্রভুর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস
আছে সে প্রভুর প্রতি আস্থা স্থাপন করে।
এইধরণের স্থানান্তরকরণ তাকে মহান করে
তোলে, উচ্চস্তরে তুলে ধরে। ভক্তের আস্থা
কখনও কমে না, এটা চিরবর্ধমান।

গুণ রহিতং কামনা রহিতং প্রতিক্ষনং বর্ধমানং ,
অবিচ্ছিন্নম সূক্ষ্মতরং অনুভবরূপম।(নারদভক্তিসূত্রাণি ৫৪)
ভক্তি কোন বৈষয়িক গুণ বা ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির বিষয় নয়। এটা সদাবর্ধমান, অত্যন্ত সূক্ষ্ম অভিজ্ঞতার বিষয়।

সত্যিকারের ভক্তি কোন পুরস্কার বা অতিরিক্ত পুরস্কারের অভাবে বিচলিত হয় না। সকল পরিস্থিতিতেই এটা বৃদ্ধি পায়। আপনার স্বামী বা স্ত্রী বা সন্তানদের সঙ্গে আনন্দ করার ক্ষেত্রে এটা কোন বাধা সৃষ্টি করে না। এইরকম ভক্ত যখন প্রতিকূল অবস্থায় পড়ে সেটাকেও আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গ্রহণ করে। ভক্তি কখনো শর্তাধীন হতে পারে না। এটা হৃদয়-মন এবং যুক্তি-অনুভব এ দুইয়ের অতীত। উচ্চস্তরের জীবনে শুদ্ধ চেতনা লাভ করার ক্ষেত্রে ভক্তি একমাত্র উপাদান যা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ।

ভালোবাসা হলো ভক্তের বিশেষ অধিকার। ভালোবাসার মানেই হলো দেওয়া, দান। দয়া ও কিছু দেবার ইচ্ছা। অপরপক্ষে আসক্তি হলো কোন

আমাদের হৃদয়কে ভক্তিপূর্ণ, উৎসর্গীকৃত ও আত্মসমর্পিত করে তৈরী করার জন্যই আমরা অভ্যাস করি। হৃদয়কে শূন্য করার এই প্রস্তুতিই সেই পরমকে আকর্ষণ করে।

কিছু দখল করা বা অন্যের কাছ থেকে কোন সুবিধা আদায় করার ইচ্ছা। একটা সদয়, সহানুভূতিশীল হৃদয় অপেক্ষা করতে জানে; কিন্তু একজন আসক্ত ব্যক্তি অপেক্ষা করতে পারে না। সুতরাং আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে এটা একটা শাশ্বত ঘটনা - কলিযুগই হোক বা সত্যযুগ - একজন আসক্তিতে মগ্ন ব্যক্তি কখনোই তাদের বিশ্বাস করতে পারে না। একজন ব্যক্তি যার হৃদয়ে ভালোবাসা ক্রমবর্ধমান সেও কখনো নিজের উপর, কখনো অন্যের উপর বিশ্বাসের ব্যাপারে অনিশ্চিত থাকে - অর্থাৎ সে কখনো নিজেকে বিশ্বাস করে না, কখনো অন্যকে বিশ্বাস করে না। যার হৃদয়ে ভক্তি আছে প্রভুর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস আছে সে প্রভুর প্রতি আস্থা স্থাপন করে। এইধরণের স্থানান্তরকরণ তাকে মহান করে তোলে, উচ্চস্তরে তুলে ধরে। ভক্তের আস্থা কখনও কমে না, এটা চিরবর্ধমান।

একবার ১৯৮১ সালে আমেদাবাদে থাকতে বাবুজী একটা সহজ বার্তা দিয়েছিলেন। তিনি কুসলভাই প্যাটেলের সঙ্গে আফ্রিকা যাচ্ছিলেন এবং মাত্র দু'রাত এখানে ছিলেন। সেই সহজ বার্তাটা এখনও আমার কানে বাজছে -

> राहें तलब में ऐसे बेख़बर हो गए,
> मंज़िल पे आके मंज़िल को ढूंढते हैं।
>
> পথের সন্ধানে এমনই বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়েছে
> যে গন্তব্যে এসেও গন্তব্য খুঁজে বেড়াচ্ছে
>
> তারা পথের সন্ধানে এমনই বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়ে গেছে যে গন্তব্যে এসেও গন্তব্য খুঁজে বেড়াচ্ছে।

কথাগুলো শুনে আমি আনন্দের উচ্ছ্বাসে ভেসে গিয়েছিলাম। এটা আমাদের গন্তব্যে পৌঁছানোটা নিশ্চিত করেছিলো। একজন ভক্তের কাছে এই যাত্রাপথটাই বস্তুতঃ গন্তব্য হয়ে উঠতে পারে। এটা নিশ্চিতভাবেই তাঁরই অনুগ্রহ ও করুণা ফলশ্রুতি। অন্যথায় আমাদের পক্ষ থেকে আমরা কিছুই করিনি।

গুরু বা ঈশ্বর সম্বন্ধে কি বলবো। ঈশ্বর যদি কিছু দাবী করেন তাহলে তো তিনিও একজন ভিক্ষুক হয়ে গেলেন। আমরা তাঁকে আমাদের পর্যায়ে নামিয়ে আনতে পারি না। একজন গুরু যিনি সমস্ত বিরুদ্ধতাকে, জীবন্মৃত অবস্থাকে অতিক্রম করে পরমের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন তিনি কি কখনো তাঁর শিষ্যদের তাঁকে পূজা করার অনুমতি দেবেন? তিনি নিজের গুরুত্বও চান না, যশ বা প্রচারও চান না। একজন সদগুরুর এই লক্ষণগুলি মনে রাখলেই আমরা বোধহয় ফাঁদে পড়ার হাত থেকে রক্ষা পাবো। ভক্ত হিসাবে আমরা অবশ্যই তাঁর সঙ্গেই একসুরে বাঁধবো যাঁকে আমরা মনোযোগ, উপাসনা ও ভালোবাসার যোগ্য বলে মনে করবো।

আমরা নিজের চেষ্টায় যাই অর্জন করিনা কেন ঈশ্বরের কাছ থেকে পাওয়া উপহারের তুলনায় সেসবই ম্লান। আমাদের সাধনা ও বছরের পর বছর ধরে একনিষ্ঠ অভ্যাসের জোরে আমরা দাবি করতে পারি না যে ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ে সম্পূর্ণভাবে ধরা দেবেন। আমাদের হৃদয়কে ভক্তিপূর্ণ, উৎসর্গীকৃত ও আত্মসমর্পিত করে তৈরী করার জন্যই আমরা অভ্যাস

করি।হৃদয়কে শূন্য করার এই প্রস্তুতিই সেই পরমকে আকর্ষণ করে। ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪৭ নম্বর শ্লোকে আমরা এই জ্ঞান লাভ করি :

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
मा कर्मफलहेतुर्भुर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि ॥

কর্মণ্যেব্যাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূ মা তে সঙ্গোস্ত অকর্মণি।

তোমার নির্দিষ্ট কর্ম করাতেই তোমার অধিকার। কর্মফলে তোমার কোন অধিকার নেই। তোমার কাজের ফলের হেতু হিসেবে কখনও নিজেকে মনে করবে না। তোমার কর্তব্য কর্ম না করার প্রতি যেন তোমার আসক্তি না জন্মায়।

আন্তরিক প্রার্থনাসহ,

কমলেশ

৪ জুলাই ২০২১
কানহা শান্তি বনম

২৪ জুলাই ২০২১-এ
পূজ্য শ্রী চারীজী মহারাজের
৯৪তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত

heartfulness
advancing in love